সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জনের কৌশল

আ মি নূ ল মো হা য় মে ন

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার একটি গ্রাম। পিচ ঢালা মসৃণ চকচকে রাস্তার দুপাশে বিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেত। ধানের লকলকে পাতায় প্রভাতী সুর্যের আলো পড়ে ঝকমক করছে। দিগন্ত জোড়া সবুজের মাঝে দ্বীপের মত গোটা বিশেক বহুতল বিল্ডিংএর একটি মহল্লা। এ রকম একটি বিল্ডিং থেকে একটি ঝকঝকে গাড়ী বেরিয়ে এলো। বাংলাদেশে তৈরী গাড়ী। ফিটফাট তরুণ ড্রাইভ করছে। পাশের সিটে বসে থাকা ব্যস্ত তরুণীটি তার স্ত্রী। সে একটি রিক্রুটিং কোম্পানী চালায়। ওভারসীজ রিক্রুটিং কোম্পানী। ইন্ডিয়া, চায়না ও আফ্রিকার দেশগুলো থেকে প্রচুর কর্মী আসে বাংলাদেশে কাজ করতে। তাদেরকে ইন্টারভিউ নিয়ে বাছাই করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী দেয়া তার কাজ। পিছনের সিটে স্কুল ড্রেস পরা দুটি ফুলের মত শিশু। সিট বেল্ট বাধা থাকলেও তারা পরস্পরের সাথে খুনসুটি করেছ। গাড়ীটি হাইওয়েতে উঠলো। কিছুদূর গিয়ে বামে মোড় নিয়ে বাচ্চা দুটোকে স্কুলে নামিয়ে গাড়িটি ছুটে চললো একটি বায়োচিপ ফেব্রিকেশন ফ্যাক্টরীতে। সেখানে তরুণটি নেমে গেলে তরুণী গাড়ি ড্রাইভ করে তার অফিসের পথে রওনা দিল।

প্রতিটি পরিবারের জন্য পাকা বাড়ী, নিজস্ব গাড়ী, প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর জন্য সম্মানজনক কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও কাজের জন্য বাংলাদেশে বিদেশীদের ভীড় - এ রকম একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ কিভাবে অর্জন করা যাবে বর্তমান নিবন্ধে তা আলোচনা করা হবে।

তবে তার আগে দেখা যাক বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদ এবং সীমাবদ্ধতা দিয়ে এ ধরণের সমৃদ্ধি অর্জন কতটুকু সম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা পৃথিবীর সবথেকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলোর একটির সম্পদ, সীমাবদ্ধতা, জনগণের বৈশিষ্ট, সমৃদ্ধি অর্জনের ইতিহাস ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখবো।

জাপানের উদাহরণঃ

পৃথিবীর সবথেকে উন্নত দেশগুলোর একটি হচ্ছে জাপান। নমিনাল জিডিপির হিসাবে জাপান হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। দেশটির নমিনাল জিডিপি হচ্ছে ৪.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৩১৫,০০,০০০ কোটি টাকা, যেখানে ২০০৬-০৭ সালে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল ৪,৬৭,৫০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রায় সত্তর গুণ। বৃহৎ শিল্পে দেশটির অবস্থান কিংবদন্তির মত। মোটর গাড়ী, ইলেক্ট্রনিক দ্রব্যাদি, মেশিন টুলস, স্টীল, জাহাজ নির্মাণ, রাসায়নিক শিল্প, টেক্সটাইল প্রভৃতি শিল্পে দেশটি উন্নত গুণগতমানের প্রতীক। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও দেশটি বিশ্বে শীর্ষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। পৃথিবীর সবথেকে বড় ব্যাংক মিতসুবিশি ইউএফজি ফাইনান্সিয়াল গ্রুপ ও সবথেকে বড় পোস্টাল সেভিং সিস্টেম হচ্ছে জাপানের। টোকিও স্টক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টক এক্সচেঞ্জ।

দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা দেখে অনেকেরই মনে হবে, দেশটি হয়তো প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেশটির আয়তন ৩৭৭,৮৩৫ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা

১২ কোটি ৭৫ লক্ষ। দেশটির অধিকাংশ স্থান পাহাড়ী। বাসযোগ্য ভূমি মাত্র ৭৬,০০০ বর্গকিলোমিটার, বাংলাদেশের অর্ধেক। বিশাল জনগোষ্ঠীর বসতি এই সীমিত আয়াতনের সমভূমিতে। বাসযোগ্য ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা বেশী হবার কারণে দেশটি পৃথিবীর সবথেকে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। জাপানের কোন খনিজ সম্পদ নেই। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে রয়েছে কিছু সামুদ্রিক মাছ। প্রকৃতি দেশটিকে সম্পদ না দিলেও দুর্যোগ দিতে কার্পণ্য করেনি। ভূমিকম্প, সুনামী, টাইফুন, অগ্নিগিরির অগ্নুৎপাত ইত্যাদির কোনটিরই কমতি নেই জাপানের।

জাপানের উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক সম্পদ কোন দেশের সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত নয়। বরং প্রতিকুল পরিবেশ, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, জনসংখ্যার আধিক্য ইত্যাদি একটি জাতিকে বেঁচে থাকার তাগিদেই উদ্যোগী, পরিশ্রমী এবং ক্ষেত্র বিশেষে দুঃসাহসী করে তোলে। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অগ্রসরতা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলেও এর সত্যতা মেলে। নদী তীরবর্তী এলাকাসমূহ, যেখানকার জনগণ প্রায়ই বন্যা, নদী ভাঙ্গন সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয় তারা দুর্যোগমুক্ত ও সহজে জীবিকা অর্জন করা যায় - এমন এলাকার তুলনায় শিক্ষা, চাকুরী, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ইত্যাদিতে বেশী এগিয়ে থাকে। অপরদিকে মাটির নীচের অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদ অধিকাংশ দেশের জন্য কাল হয়ে দাড়াতে পারে, বিশেষ করে দেশটি যদি সামরিকভাবে দুর্বল হয়।

জাপানের সমৃদ্ধির সবথেকে বড় উপকরণ ধরা হয় তার জনগোষ্ঠীর সমরূপতাকে। যেহেতু দেশটির জনগণ একই নৃতাত্ত্বিক উৎসের, তাদের ভাষা এবং ধর্মও এক, তাই তাদের মধ্যে এক ধরণের সহজাত ঐক্য গড়ে ওঠে এবং তাদেরকে বিভক্ত করে একে অন্যের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে জনগণের প্রত্যেকের শ্রম, মেধা, ও উদ্যোগ পরস্পর বিরোধী না হয়ে বরং পরস্পরের পক্ষে কাজ করে এবং সামগ্রিকভাবে তা একটি বিশাল ইতিবাচক ফল নিয়ে আসে। বিষয়টি উপলব্ধি করা খুব সহজ। ২ এবং ২ পরস্পরের সাথে যুক্ত হলে ফলাফল হয় ৪, অপরদিকে ২ থেকে ২ বিয়োগ হলে তার ফল শূণ্যে এসে দাড়ায়। মানুষ অসীম ক্ষমতার অধিকারী। সে ক্ষমতা যখন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একদিকে চালিত হয়, তখন সে ক্ষেত্রে মানুষ অকল্পনীয় সাফল্য অর্জন করে। যে জাতির জনগণের মধ্যে অন্তঃকলহ নেই, তারা তাদের শক্তি, ক্ষমতা, মেধা, শ্রম, উদ্যোগ - ইত্যাদি একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে নিজেদের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও সামরিক উন্নয়ন, গবেষণা ইত্যাদিতে নিয়োগ করে। ফলশ্রুতিতে তারা অবিশ্বাস্য রকমের উন্নতি সাধন করে থাকে।

অপরদিকে মানুষের সবথেকে বড় শত্রু হচ্ছে নিজেদের মধ্যে বিরোধ, যুদ্ধ ও হানাহানি। কোন জনগোষ্ঠীর সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে যতই মেধাবী, পরিশ্রমী, দক্ষ ও উদ্যোগী হোক না কেন, তারা যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা ব্যবহার করে তাহলে তাদের কাজের সামগ্রিক ফলাফল নেতিবাচক না হয়ে পারে না। সমরূপ জনগোষ্ঠীর আরেকটি বড় সুবিধা হচ্ছে, তাদের মধ্যে খুব সহজেই জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে এবং জাত্যাভিমান জাগিয়ে তোলা যায়। জাতীয় ঐক্য ও জাত্যাভিমান সম্পন্ন কোন জাতির সাথে অন্যান্য জাতি অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা সামরিক কোন প্রতিযোগিতায় পেরে উঠতে পারে না।

জাপানের ভৌগলিক অবস্থান তার উন্নয়নে কিছুটা ভূমিকা রেখেছে বলে অনেকের ধারণা। এটি একটি দ্বীপরাষ্ট্র যার চতুর্দিকে সমুদ্র। সমুদ্রের ওপারে রয়েছে চায়না ও রাশিয়া। ফলে দেশটির একটি

কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। এ কারণে দেশটিকে সব সময়েই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে আসছে আমেরিকা ও তার মিত্ররা।

জাপানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ইতিহাস ও কৌশলঃ

এখন জাপানের উন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ইতিহাস দেখা যাক। দেশটি শত শত বছর ধরে এ ধরণের সমৃদ্ধ ছিল না। ১৮৮০ সালের আগে জাপান ছিল একটি দরিদ্র ও অনুন্নত দ্বীপরাষ্ট্র। দেশটি সে সময় আক্ষরিক অর্থেই বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই বিচ্ছিন্নতার অন্যতম কারণ ছিল আন্তর্জাতিক ভাষাগুলোতে জাপানীদের জ্ঞানের অভাব। সমৃদ্ধির পথে যাত্রা শুরুর মাত্র ৩০ বছরের মাথায় দেশটি এতো সমৃদ্ধ, উন্নত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তা রাশিয়ার নৌবহরকে পরাজিত করে। অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ১৮৮০ সালে দেশটি নিম্নলিখিত কাজগুলো হাতে নেয়ঃ

ক. আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অত্যাধিক প্রাধান্য দিয়ে দেশের সকল তরুণ-তরুণীর জন্য একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে।

খ. হাজার হাজার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে সরকারী উদ্যোগে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিতে পাঠানো হয়। তিন হাজার পশ্চিমা শিক্ষককে জাপানে আনা হয় বিজ্ঞান, অংক, প্রযুক্তি ও বিদেশী ভাষা শেখানোর জন্য।

গ. দীর্ঘ রেল লাইন বসানো, সড়ক তৈরী ও উন্নয়ন এবং ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে দেশকে দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

ঘ. শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ নেয়। বেসরকারী খাতকে বিকশিত করার জন্য সরকার উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। এমনকি সরকার কল-কারখানা এবং শিপইয়ার্ড তৈরী করার পর তা নামমাত্র মূল্যে উদ্যোক্তাদের কাছে বিক্রি করে।

জাপানের সাথে বাংলাদেশের মিল-অমিলঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনার নিরীখে জাপানের সাথে এশিয়ার যে কয়েকটি দেশের সব থেকে বেশী মিল রয়েছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জাপানের মত বাংলাদেশের মানুষও একই নৃতাত্ত্বিক উৎসের এবং একই ভাষা-ভাষী। এখানে বংশ-গোত্রবাদ নেই, নেই ধর্ম বা বর্ণভিত্তিক হানাহানি। এ কারণে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নানা ষড়যন্ত্রের পরও এদেশবাসীকে দীর্ঘস্থায়ী হানাহানিতে লিপ্ত করা যায় নি।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানও জাপানের মত কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ। দেশটির বিশাল সীমান্ত রয়েছে ইন্ডিয়ার সাথে। অপরদিকে চায়নার সাথে আমাদের সীমান্ত না থাকলেও দূরত্ব খুব কম। দুটি সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সন্নিকটে থাকার কারণে আমেরিকা ও তার মিত্রদের জন্য বাংলাদেশের ভূমির একটি কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। বাংলাদেশ চাইলে এটি ব্যবহার করে আমেরিকা, ভারত ও চায়না থেকে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক সুবিধা নিতে পারে। তাছাড়া বাংলাদেশের রয়েছে ১২০

কিলোমিটার দীর্ঘ সমূদ্র সৈকত যা পৃথিবীর দীর্ঘতম। দীর্ঘ সৈকত ও সমূদ্রসীমার গুরুত্ব যেমন পর্যটনে রয়েছে তেমনি রয়েছে সমূদ্রপথে যোগাযোগ ও কৌশলগত কারণে।

জাপানের কোন প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকলেও বাংলাদেশের রয়েছে আবাদযোগ্য বিশাল ভূমি যা জাপানের চেয়ে দ্বিগুণ, রয়েছে গ্যাস, কয়লা ও তেলের মত খনিজ সম্পদ। অপরদিকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা শুরুর আগে মানব উন্নয়নে জাপান যে অবস্থানে ছিল, বাংলাদেশ তার থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছে। হাজার হাজার বাংলাদেশী ইতোমধ্যেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন বিশ্বের দেশে কাজ করছে। এদেশের শিক্ষিত শ্রেণী ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ঠ দক্ষ। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যে উন্নয়ন ঘটছে, সেগুলি সহজে আয়ত্ব করার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য কোন ভাষাগত বাধা নেই।

তবে জাপানের সাথে বাংলাদেশের কিছু অমিলও রয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে এ এলাকার মানুষ কিছুটা কর্মবিমুখ। এ দেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর হওয়ার কারণে জীবন ধারণের জন্য এ এলাকার মানুষদেরকে খুব বেশী পরিশ্রম করতে হয় নি। এখানে দীর্ঘদিন ধরে বর্ণবাদী সমাজ ও ধর্মীয় ব্যবস্থা চালু ছিল। সেখানে যারা উৎপাদন ও কৃৎকৌশলের সাথে জড়িত ছিল যেমন কৃষক, কামার, কুমার, তাতী, জেলে - তাদেরকে রাখা হয়েছিল বর্ণবাদী সমাজের সর্বনিম্নস্তরে এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে তারা অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য হতো। জাপানের সাথে আমাদের অপর পার্থক্যটি রয়েছে জাত্যাভিমানের ক্ষেত্রে। দীর্ঘদিন পরাধীন থাকার কারণে আমাদের মধ্যে এখনও জাত্যাভিমান গড়ে ওঠে নি। একই কারণে জাতিকে বিভক্ত রাখার মত কোন প্রাকৃতিক কারণ না থাকলেও আমরা বিভিন্ন ইস্যূতে বিভক্তি ও সংঘাতের মধ্যে নিপতিত হয়ে পড়ি। ফলে জনগোষ্ঠীর সমরূপতা থেকে যে সুবিধা পাওয়ার কথা, আমরা তা পাচ্ছি না।

	জাপান	বাংলাদেশ
আয়তন	৩৭৭,৮৩৫ বর্গ কিলোমিটার	১৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার
বাসযোগ্য ভূমির পরিমাণ	৭৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার	১৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা	১২ কোটি ৭৫ লক্ষ	১৫ কোটি
খনিজ সম্পদ	তেমন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই	গ্যাস, কয়লা, তেল
অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ	সামুদ্রিক মাছ	অতি উর্বর কৃষি জমি, বনভূমি, পৃথিবীর দীর্ঘতম সমূদ্র সৈকত
প্রাকৃতিক দুর্যোগ	ভূমিকম্প, সুনামী, টাইফুন, অগ্নিগিরির অগ্নুৎপাত	বন্যা, কাল বৈশাখী
ভৌগলিক অবস্থান	চারিদিকে সমূদ্র বেষ্টিত; রাশিয়া ও চীনের সাথে সমূদ্র সীমানা থাকায় কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ	তিন দিক বেষ্টিত আরেকটি বৃহৎ রাষ্ট্র দ্বারা, একদিকে সমূদ্র; ভারতের সাথে সীমানা ও চীনের অতি সন্নিকটে থাকার কারণে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ
জনগোষ্ঠী	সমরূপ জনগোষ্ঠী	সমরূপ জনগোষ্ঠী
জনগণের অভ্যন্তরীণ সংঘাত	কোন সংঘাত নেই	সংঘাতের প্রাকৃতিক উপাদান না

		থাকলেও রাজীনিতে কেন্দ্র করে জনগণের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়
জাত্যাভিমান	জনগণ প্রচন্ড জাত্যাভিমান সম্পন্ন	জনগণের মধ্যে জাত্যাভিমানের অভাব রয়েছে

দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের বিচারে কয়েক দশকের মধ্যে জাপানের মত সমৃদ্ধি অর্জন করা বাংলাদেশের জন্য অসম্ভব নয়।

উপরের আলোচনাটি অতিমাত্রায় তত্বীয় মনে হতে পারে। বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যাকে কি আসলেই জনসম্পদে রূপান্তরিত করা যাবে? যায়যায়দিনে পূর্বে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে দেখানো হয়েছিল কিভাবে আমাদের নিজস্ব সম্পদ ও মেধা দিয়ে দেশে এক মিলিয়ন উদ্যোক্তা তৈরী করা যায় এবং তার মাধ্যমে এক কোটি নতুন কর্মসংস্থান তৈরী করে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১৫ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব। এ ধরণের একটি ঘটনা ঘটলে দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে যা অর্থনীতিতে এমন শক্তি ও গতিবোগ সঞ্চার করবে এবং জনগণের মধ্যে এমন আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করবে যে বাংলাদেশের দ্রুত সমৃদ্ধি ঠেকিয়ে রাখা কারোর পক্ষেই সম্ভব হবে না। একবার দারিদ্র ও বেকারত্বের শিকল ছিড়তে পারলে পনের কোটি আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ, ঐক্যবদ্ধ এই বিশাল জনগোষ্ঠীর অভিযাত্রা কতদূর পর্যন্ত পৌছাবে তা কল্পনা করাও দূরুহ।

বাংলাদেশের সমৃদ্ধির মৌলিক কৌশলঃ

এখন দেখা যাক, বাংলাদেশ কি কৌশলে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। একটি জাতির সমৃদ্ধি অর্জনের বিভিন্ন পথ রয়েছে। প্রচুর পরিমাণে আবাদি জমি থাকলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দেশ প্রাচূর্য অর্জন করতে পারে। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করে বিভিন্ন ধরণের সেবা বিপননের মাধ্যমেও একটি জাতি সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে। জনসংখ্যা কম ও তাদের হাতে যথেষ্ঠ অর্থ থাকলে এবং ভৌগলিক অবস্থা সুবিধাজনক হলে দেশকে দুবাই বা সিঙ্গাপুরের মত আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত করার মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। আবার আমেরিকার মত সামরিক শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে অন্যের সম্পদ দখল করে এবং অস্ত্র বিক্রয় করেও সম্পদশালী দেশে পরিণত হওয়া যায়। তবে টেকসই সমৃদ্ধির জন্য সবথেকে কার্যকর কৌশল হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পারদর্শীতা অর্জন করে শিল্প উৎপাদনে এগিয়ে যাওয়া। একটি দেশ শিল্পে উন্নত হবার সাথে সাথে দেশের জনগণ শিক্ষা, প্রযুক্তি ও দক্ষতার দিক থেকে এগিয়ে যায়, ফলে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বহিঃ শক্তির আগ্রাসন তার অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে না।

বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র আয়তনের, ঘনবসতিপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত কম প্রাকৃতিক সম্পদের দেশের সমৃদ্ধি, অগ্রসরতা ও উন্নতির ক্ষেত্রে এমন কৌশল নিতে হবে যাতে জনগণের সিংগভাগের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। জনগণ যদি বিজ্ঞান শিক্ষিত, প্রযুক্তিতে পারদর্শী, পরিশ্রমী, উদ্যোগী ও ডিসিপ্লিন্ড হয় তাহলে তাদের প্রত্যেকের শক্তি, ক্ষমতা ও মেধা একে অন্যের সাথে যুক্ত হয়ে একটি বিশাল অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। তাই, বাংলাদেশের দ্রুত উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রধান কাজ হচ্ছে, জনগণকে সম্পদে

রূপান্তরিত করা। এর জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন তাদেরকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রধান শিক্ষা দেয়া এবং প্রচুর সংখ্যক উদ্যোক্তা তৈরী করার মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়নের ব্যবস্থা করা; তেমনি দরকার তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও জাতিগত আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার মাধ্যমে জাত্যাভিমান জাগ্রত করা এবং জাতিকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে পারার মত উপাদানগুলো দূর করা।

অতি উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত হতে হলে দীর্ঘমেয়াদে ভারী ও উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। তবে এর জন্য যে পুজি, প্রযুক্তি, দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো প্রয়োজন তা অর্জন করা এখনই সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে পুজি সংগ্রহের চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু এ ধরণের উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প স্থাপন করতে হলে যে ধরণের দক্ষ কর্মী প্রয়োজন, বর্তমানে বাংলাদেশে তা পাওয়া দুস্কর।

তাছাড়া বাংলাদেশের বিদেশী বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। বিগত বছরগুলোতে এদেশে টাকার অংকের হিসাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিদেশী বিনিয়োগ হয়েছে হয়েছে বটে, কিন্তু, তার অধিকাংশ এসেছে জ্বালানী ও টেলিযোগাযোগ খাতে। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দুর্নীতিপ্রবণ দেশগুলোতে জ্বালানী খাতটি হচ্ছে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়ার সবথেকে লোভনীয় খাত। বস্তুতঃ পৃথিবীতে বর্তমানে দেশে দেশে যত যুদ্ধ, বিগ্রহ, আগ্রাসন ও রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে তার প্রায় সবগুলোই সংশ্লিষ্ট দেশের জ্বালানী সম্পদে পরাশক্তিগুলোর নযর পড়ার কারণে। তেলের জন্য ইরাক রক্তের নগরীতে পরিণত হয়েছে এবং আফ্রিকার দেশে দেশে গৃহযুদ্ধের দাবানল জ্বলছে। বাংলাদেশের দুজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীই জ্বালানীখাতে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত। জ্বালানী বিষয়ক চুক্তিগুলোতে সব সরকারই অস্বচ্ছতা বজায় রাখে। কয়েকটি বিদেশী কোম্পানীর সাথে আমাদের সরকারগুলো কয়লা উত্তোলনের জন্য যে চুক্তি করেছিল তাতে উত্তোলিত কয়লার ৯৪ শতাংশ ছিল উক্ত কোম্পানীর প্রাপ্য। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে এ খাতে কি ধরণের পুকুর চুরি ঘটে থাকে। ফলে জ্বালানী খাতে বিনিয়োগকে দেশের সম্পদ চুরির সূচক হিসাবে দেখানো হলে তাতে সত্যের খুব একটা অপলাপ হয় না।

অপরদিকে টেলিযোগাযোগ খাতে বিদেশী বিনিয়োগের ফলে দেশে মোবাইল ফোনের অভাবনীয় বিস্তৃতি ঘটেছে সত্য, কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই খাতটি দেশের সম্পদ বিদেশে নিয়ে যাবার একটি কার্যকর মাধ্যম। একজন রিকসাচালক বুঝতেও পারছে না যে, তার ঘাম ঝরানো টাকা দিয়ে সে যখন গ্রামে তার মায়ের সাথে কথা বলছে তখন সেই টাকার অর্ধেকটা বিদেশে চলে যাচ্ছে । দেশপ্রেমিক তরুণটি জানতেও পারছে না, মোবাইলে তার প্রিয়ার সাথে লম্বা কথার মাধ্যমে সে আসলে তার প্রিয় দেশের টাকা বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ফলে এ সকল বিদেশী বিনিয়োগ সমাজের অভিজাত শ্রেণীর জন্য বেশী বেতনের চাকুরী আর ক্ষমতাশীনদের জন্য সাফল্যের খতিয়ান দেখানো ছাড়া দেশের সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে তেমন কোন অবদান রাখতে পারছে না।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকৃত ভূমিকা রাখতে পারে - এ ধরণের বিদেশী বিনিয়োগ আনতে হলে আমাদেরকে শিল্পায়নে নিজে থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে থাকতে হবে। বিদেশী পুজিপতিরা বাংলাদেশে শিল্প-কারখানা স্থাপন করবেন কেন? তারা তাদের টাকা এখানে খাটাবেন যদি আমরা তাদেরকে সস্তায় দক্ষ কর্মী কিংবা কাঁচামাল যোগান দিতে পারি, অথবা, বাংলাদেশ কিংবা তার কাছের কোন স্থানে উৎপাদনকৃত পণ্যের ভালো বাজার থাকে। সস্তায় কাঁচামাল যোগান দেয়া আমাদের জন্য সম্ভব নয়,

কেননা, লোহার মত খনিজ সম্পদ আমাদের নেই এবং আমাদের সীমিত তেল-গ্যাস আমরা সস্তায় বিকিয়ে দিতে চাই না।

সেক্ষেত্রে আমরা দক্ষ, পরিশ্রমী ও প্রযুক্তিতে পারদর্শী কর্মী সরবরাহ করার চেষ্টা করতে পারি । এ জন্য প্রথমে শ্রমঘন ও সাধারণ প্রযুক্তির শিল্প দিয়ে একটি গণশিল্প বিপ্লব সংঘটিত করতে হবে, যাতে দেশের শিক্ষিত ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিল্প উদ্যোক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে নতুন গতি আসবে, বৈধ পুঁজি সঞ্চিত হবে, জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দক্ষ, পরিশ্রমী ও প্রযুক্তিতে পারদর্শী কর্মী হিসাবে গড়ে উঠবে। তখন একদিকে যেমন এই সকল কর্মীকে ব্যবহারের জন্য শিল্প খাতে প্রচূর বিদেশী বিনিয়োগ আসবে, তেমনি ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার মত বৈধ পুজি দেশের অভ্যন্তরেও সঞ্চিত হবে।

সমৃদ্ধির সাথে অর্থের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে তাই এখানে ব্যংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্রুত বিকাশ লাভের ব্যবস্থা করতে হবে।

এখন দেখা যাক, কিভাবে ধাপে ধাপে আমরা সমৃদ্ধির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছতে পারি।

প্রথম ধাপঃ প্রস্তুতি পর্ব

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, বাংলাদেশকে জাপানের মত একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে হলে প্রথমে তাকে তার নিজের সম্পদ দিয়ে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে থাকতে হবে। বস্তুতঃ বাংলাদেশে যে অলস শিক্ষা, মেধা ও অর্থ রয়েছে তা ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরণের একটি গণশিল্প বিপ্লব সহজেই ঘটানো যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে এক মিলিয়ন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে এক কোটি কর্মস্থান সৃষ্টির সম্ভাব্যতা এবং তার জন্য একটি প্রকল্পের রূপরেখা ইতোপূর্বে যায়যায়দিনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলাম। তাতে দেখানো হয়েছিল যে, এক লক্ষ টাকারও বেশী বিনিয়োগ করতে পারে এ ধরণের শিক্ষিত তরুন-তরুণীর সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশী। সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়ে এ অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হলে তার ফলে এক কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এর জন্য সরকারকে প্রধানতঃ চারটি কাজ করতে হবেঃ

১. তরুণ উদ্যোক্তারা কি ধরণের শিল্প স্থাপন করতে পারে এবং সে জন্য কি ধরণের প্রস্তুতি প্রয়োজন, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে উদ্যোক্তা গাইড তৈরী করা।

২. উদ্যোক্তা গাইডের উপর ভিত্তি করে তরুণ-তরুণীদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তা মেলার আয়োজন, টিভি চ্যানেলগুলোতে এ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রাচার ইত্যাদি পদক্ষেপ নেয়া।

৩. এন্টারপ্রাইজ তৈরীতে প্রয়োজনীয় কারগিরী সহায়তা সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।

৪. সম্ভাব্য উদ্যোক্তারা এক এক করে মাঠে নামা শুরু করলে এক পর্যায়ে তাদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা।

দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি শিল্পকেন্দ্রিক হলেও তাতে কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকেই যাবে। জনসংখ্যা বেশী হবার কারণে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা যেন কোনভাবেই বিঘ্নিত না হয় তার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে খাদ্যে স্বনির্ভরতার কোন বিকল্প নেই। চাল, ডাল, তেল ও নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য খাদ্য শস্যের জন্য বিদেশ নির্ভরতার খেসারত বর্তমান ও বিগত সরকারসমূহ দিয়ে আসছে। জমি অতি উর্বর হওয়ার কারণে আমাদের যে পরিমাণ কৃষিজমি রয়েছে তা দিয়ে সহজেই আমরা নিজেদের খাদ্যের চাহিদা মিটিয়েও শস্য বিদেশে রফতানী করতে পারি। মনে রাখা দরকার যে বিগত তিন দশকে কৃষি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে তার নিয়ন্তা ছিলেন এদেশের আর্থিক সামথ্যহীন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণহীন কৃষকেরা। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষাবাদ করার মত জ্ঞান বা যন্ত্রপাতি যেমন তাদের অধিকাংশের নেই, তেমনি অনেক ক্ষেত্রেই তারা সময়মত পর্যাপ্ত সার ও সেচ দিতে পারেন না, ভালো বীজও অনেকে বপন করতে পারেন না। এই ধরণের অবহেলার মধ্যেও যদি কৃষি আজকের অবস্থায় আসতে পারে তাহলে সমাজের শিক্ষিত ও সামর্থ্যবান অংশকে কৃষিতে সম্পৃক্ত করা গেলে এ খাত আমাদের সকল প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে।

কৃষিখাতে আর্থিক ও শিক্ষাগত সামর্থ্যকে সংযুক্ত করতে হলে তিনটি কাজ করতে হবেঃ

১. কৃষকদের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল এলাকায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ রয়েছে সেখানে কৃষির উৎপাদন অন্য এলাকার তুলনায় অনেক বেশী। এর কারণ, উক্ত এলাকাগুলোর কৃষকরা বিশ্ববিদ্যায়লগুলো কতৃক উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তির সংস্পর্শে আসার কিছুটা সুযোগ পায়। দেখা যাচ্ছে, কোনভাবে কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের মধ্যে ছড়ানো গেলেই তার অভাবনীয় সুফল পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে কৃষকগণকে যদি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া যায়, তাহলে কৃষি উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। সরকার এ জন্য কৃষকদের জন্য এক বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করতে পারে যাতে যে কোন বয়সের যে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতার কৃষক অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রতি গ্রামে যদি একজন কৃষকও ধরণের ডিপ্লোমা পায়, তাহলে সে গ্রামের অধিকাংশ কৃষক তার কাছ থেকে চাষাবাদ বিষয়ক পরামর্শ পেতে পারবে। কৃষকদেরকে উৎসাহিত করতে কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২. কৃষি শিক্ষার প্রসার বাড়াতে হবে এবং এই সকল বিষয় থেকে পড়াশোনা করার পর তরুণ-তরুণীরা যেন নিজেরা কৃষির সাথে সম্পৃক্ত হয় ও কৃষি উদ্যোক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি পাশাপাশি কৃষি শিক্ষাধারীদের জন্য কৃষি প্রকল্পে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবছর ঝরে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রাপ্ত শিক্ষা কোন কাজে লাগে না। উপরন্ত, কিছুদিন লেখাপড়া করার কারণে তারা কৃষি বা অন্যান্য শ্রমঘন পেশায় যেতে মানসিকভাবে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। এ সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য উন্মুক্ত ভোকেশনাল কোস চালু করতে হবে। অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন যে কেউ এ সকল কোর্সে অংশ নিতে পারবে। তাতে গার্মেন্টস, ইলেকট্রিক, ইলেকট্রণিক এসেম্বলী, ফার্নিচার তৈরী, মেকানিকাল যন্ত্রাংশ তৈরী ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। উক্ত কোর্স সম্পন্নকারীরা গণশিল্প বিপ্লবের কর্মী বাহিনী হিসাবে

কাজ করবে। বিদেশে এই সকল দক্ষ শ্রমিক রফতানী করা গেলে বহুগুণ বেশী বৈদেশিক মূদ্রা আয় করা যাবে।

সরকার আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করলে এবং দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে সাত থেকে দশ বছরে এই ধাপটি অতিক্রম করা যাবে।

দ্বিতীয় ধাপঃ উত্তরণ পর্ব

প্রথম ধাপটি অতিক্রম করতে পারলে বাংলাদেশে প্রচুর সংখ্যক শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে। কৃষি উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে। দক্ষ জনশক্তি বিদেশে রফতানি করার কারণে এ খাত থেকে অনেক গুণ বেশী অর্থ আসবে। বিদেশে কর্মরত দেশের মেধাবী এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত সন্তানদের একটি অংশ দেশে ফেরা শুরু করবে। চায়না বর্তমানে যে অবস্থানে রয়েছে, অর্থাৎ কম গুণগতমানের প্রচুর শিল্প উৎপাদন - বাংলাদেশ সে রকম একটি পর্যায়ে পৌঁছাবে। পাশাপাশি ক্রমাগত প্রবৃদ্ধির কারণে বড় বিনিয়োগ করার মত পুজি দেশের ভিতরেই তৈরী হবে। তখন আমরা গাড়ি তৈরীর মত উচ্চ প্রযুক্তির ও ভারী শিল্প শুরু করতে পারবো। তখন আমাদের জন্য প্রয়োজন হবে আরও উন্নতমানের জনবল। এ ধরণের জনবল পাবার জন্যও আমাদের আগে থেকে পরিকল্পনা নিতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপে যে ধরণের দক্ষ ও প্রযুক্তিতে পারদর্শী জনবল প্রয়োজন, তার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় যথেষ্ঠ পরিবর্তন আনতে হবে। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে শিক্ষা খাতে সরকারী এবং বেসরকারী বিনিয়োগ বেড়েছে, শিক্ষার হার বেড়েছে এবং বেড়েছে নারীদের অংশগ্রহণ। এটি একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও সে শিক্ষা আমাদের তেমন কোন কাজে লাগছে না। কেননা, একদিকে যেমন পাঠ্য বিষয় হিসাবে যা নির্ধারণ করা হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা তা শিখছে না, অপরদিকে এমন সব বিষয় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শেখানো হচ্ছে, যা উৎপাদন কিংবা সার্ভিস কোনটিতেই কাজে লাগে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা হাজার হাজার সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণীকে ইসলামের ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাংলা সাহিত্য ইত্যাদি শিখিয়ে প্রকারান্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রতিযোগীতার এ বিশ্বের জন্য অনুপযুক্ত হিসাবে তৈরী করছি। সে তুলনায় খুব কম সংখ্যক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, কেমিস্ট, একাউন্টেন্ট, এমবিএ তৈরী করা হচ্ছে।

উচ্চ শিক্ষার অপচয়ের বিষয়টিও আমাদের দক্ষ জনবল প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষি করছে। জনগণের যে অতি ক্ষুদ্র অংশ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, তাদের একটি বড় অংশ যে বিষয়ে লেখাপড়া করেছে সে বিষয়ে কাজ করছে না। এক্ষেত্রে সবথেকে এগিয়ে রয়েছে সরকারী খাত। বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ সরকারী কর্মকর্তা রয়েছেন, যাদের সকলেই গ্রাজুয়েট। অনেকেই আবার দেশ-বিদেশের নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারী খরচে বা স্কলারশীপে মাস্টার্স ও পিএইচডি করেছেন। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই যে বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন সে বিষয়ক কাজ করছেন। দেখা যাবে ডাক্তারী পাশ করে কেউ সরাকরের হিসাব রক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন, কেউ বা পুলিশ কিংবা কাস্টমসে যোগ দিয়েছেন। তাছাড়া রয়েছে নিয়মিত এক মন্ত্রণালয় থেকে অপর মন্ত্রণালয়ে বদলীর বিষয়টি। এ সকল কারণে দেশের সবথেকে মেধাবীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারী চাকুরীতে যোগ দিলেও আমাদের সিভিল সার্ভিসে কর্মদক্ষতার প্রবল সংকট রয়েছে।

নকল প্রবণতা আপাততঃ কমে গেলেও পাঠদান ও পরীক্ষার পদ্ধতি এমন যে ছাত্র-ছাত্রীরা কেবল মুখস্ত করতে শেখে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের মান নিয়েও যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। একেতো মেধাবীরা এই পর্যায়ের শিক্ষকতায় যেতে চায় না, তার উপর শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়-পূর্ব শিক্ষকদের মধ্যে মেধার সংকট চরম আকার ধারণ করেছে।

শিক্ষা হবে আমাদের সমৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। এ কারণে একদিকে যেমন শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ অনেক বাড়াতে হবে, তেমনি নিশ্চিত করতে হবে যে, পঠিত বিষয় যেন ছাত্র-ছাত্রীরা মুখস্ত না করে ভালোভাবে শিখতে পারে এবং তা জীবিকা অর্জনে কাজে লাগে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানের অপচয় রোধ করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলাফল এই ধাপে কাজে লাগলেও সে পরিবর্তনের কাজটি প্রথম ধাপেই শুরু করতে হবে।

ব্যাপক শিল্পায়নের কারণে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর চাহিদা বহুগুণে বেড়ে যাবে। আমাদের খনিজ জ্বালানীকে সে সময়ের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে হবে, নিজেদের তেল, গ্যাস ও কয়লা নিজেরা উত্তোলনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পাশাপাশি পারমাণবিক জ্বালানীর ব্যবস্থা করতে হবে। স্থল ও পানিপথে যোগাযোগ এবং তথ্য যোগাযোগ অবকাঠামোর চাহিদাও তখন বেড়ে যাবে। উক্ত অবকাঠামোগুলো উন্নয়নের কাজ প্রথম ধাপেই শুরু করতে হবে। অপরদিকে শিল্প-কল কারখানা বৃদ্ধি এবং বর্ধিত অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার কারণে কৃষিজমির পরিমাণ যথেষ্ঠ কমে আসবে। এ কারণে গ্রামগুলোতে বহুতল বিল্ডিং নির্মান করে অল্প স্থানে অধিক মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা, জমির আইল তুলে দেয়ার মত ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ প্রস্তুতি পর্বেই নিতে হবে।

সমৃদ্ধির দ্বিতীয় ধাপটি অতিক্রম করতে দশ থেকে পনের বছর লাগতে পারে।

তৃতীয় ধাপঃ বিকাশ পর্ব

দ্বিতীয় ধাপ অতিক্রম করলে বাংলাদেশ মালেশিয়ার মত শিল্পায়িত দেশে পরিণত হবে। তখন আমরা অন্যের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিল্প পণ্য প্রস্তুত করার পরিবর্তে নিজেরাই নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার দিকে মনোনিবেশ করবো। এ পর্যায়ে গবেষণা, জ্ঞান ভিত্তিক শিল্প ইত্যাদিতে অনেক বেশী বিনিয়োগ করতে হবে। এ পর্বে যে ধরণের মানবসম্পদ প্রয়োজন হবে, তার পরিকল্পনাও আমাদের প্রথম ধাপেই করতে হবে।

সমৃদ্ধির পূর্বশর্তঃ

তবে এ সকল কিছুর পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি সংঘাতমুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ। বাংলাদেশ তার তিন যুগের জীবনের খুব কম সময়েই সংঘাতমুক্ত থাকতে পরেছে। রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে জাতি প্রায় পুরোটা সময়েই বিভক্ত হয়ে থেকেছে। অস্থিতিশীল অবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাধা হয়ে দাড়িয়েছে, শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠীর চিন্তা ও শ্রমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের বা নিজের জাতির উন্নয়নের পিছনে ব্যয় না হয়ে বরং নিজ জনগণেরই অকটি অংশের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। খুবই নগণ্য কারণে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেগুলো মাসের পর মাস বন্ধ থেকেছে। তরুণ-তরুণীদের যে সচেতন অংশটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা রাখতে পারতো, তারা তাদের মেধা ও প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য অংশকে একে অন্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে আসছে। কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদগগণ জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পরিবর্তে পিছনে ঠেলে দেয়ার ও সংঘাত সৃষ্টির দিকে বেশী আগ্রহ দেখিয়েছেন। একটি জাতির মননশীল অংশ তাদের চিন্তাশক্তিকে যে দিকে পরিচালনা পরিচালনা করেন, সে জাতি সেদিকেই পরিচালিত হয় ও সে বিষয়েই দক্ষতা অর্জন করে। এভাবেই কোন জাতি যোদ্ধা হিসাবে, কোনটি দক্ষ কর্মী হিসাবে, কোনটি ফাইন আর্টসের সমঝদার হিসাবে আর কোনটি বা নিজেরা মারামারি করে শক্তিক্ষয়ে অভ্যস্ত হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমরা এতোদিন শেষোক্ত পথ ধরে চলে এসেছি।

জাতি বিভক্তি ও অন্তঃবিরোধের মধ্যে নিমজ্জিত থাকলে বিবাদমান পক্ষগুলো বিদেশীদের কাছে সাহায্যের জন্য দেশের স্বার্থহানি করতেও পিছপা হয না। বিদেশী শক্তির সহায়তায় দেশের জনগণের একটি অংশকে দুর্বল করতে তাদেরকে নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তুলে দেয়। কখনো কখনো এর পরিণতি স্বার্বভৌমত্ব হারানোর মত মারাত্মক হতে পারে। তাছাড়া, বিশ্বায়নের পরিধি ও গভীরতা যত বাড়ছে, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার প্রতিযোগিতা ততো বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজেরা বিভক্ত থাকলে অন্যান্য দেশের সাথে দরকষাকষির ক্ষমতা কমে যায়। দেশের বিভিন্ন শক্তি তখন বিদেশী শক্তির রাজনৈতিক সমর্থনের বিনিময়ে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে দ্বিধা করে না, নিজেদের কৌশলগত ভৌগলিক অবস্থানের কারণে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

ফলে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এই ঐক্যের অর্থ এই নয় যে সকলকে একই রাজনৈতিক আদর্শ বা মত গ্রহণ করতে হবে। বরং, মত ও আদর্শের ভিন্নতার কারণে যেন সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সেই কাজটি করতে হবে। এর জন্য সহনশীলতা বাড়াতে হবে। তাছাড়া, জাত্যাভিমানের অভাব এবং বাংলাদেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে না পারাটাও আমাদের বিভেদের অন্যতম কারণ। একদল মানুষ যখন হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে তখন তাদের মধ্যে বিভেদ, বিসম্বাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাই জাতীয় ঐক্য গড়তে সবথেকে কার্যকর উপায় হচ্ছে তরুণদের মধ্যকার হতাশা দূর করে তাদেরকে জীবন যুদ্ধে সাফল্যের স্বাদ দেয়া।

কে হবে সমৃদ্ধির কান্ডারী?

দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশকে অতি দ্রুত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য প্রধানতঃ প্রয়োজন এমন এক গণজাগরণ যা জাতীয় আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করবে, জনগণকে অতি সমৃদ্ধ একটি দেশের স্বপ্ন দেখাবে, কর্মবিমুখতার উত্তরাধিকারকে কাটিয়ে উঠে কর্মমূখী করে তুলবে এবং সর্বোপরি গড়ে তুলবে শক্তিশালী জাতীয় ঐক্য। এক্ষেত্রে সমাজের মননশীল অংশকে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। কবিরা আশা জাগানিয়া কবিতা লিখবেন, শিল্পীরা বাংলাদেশের সমৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে গান গাইবেন, কলামিস্টগণ এ বিষয়ে কলাম লিখবেন এবং ইলেকট্রনিক ও পৃন্ট মিডিয়া সেগুলি প্রচার করবে। প্রবাসী বাংলাদেশীরা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। বাংলাদেশের জনগণের মেধা ও কর্ম শক্তির সম্ভাবনা যে কত বেশী তা তাদের মত আর কেউ উপলব্ধি করতে পারেন না।

তবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তা-চেতনায় বড় ধরণের পরিবর্তন আনতে রাজনৈতিক দলগুলোর বিকল্প এখনও তৈরী হয়নি। যেহেতু এ দেশের জনগণ রাজনীতি সচেতন এবং তাদের অধিকাংশই কোন

না কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক তাই জনগণের মানস গঠনে রাজনৈতিক নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রকৃতপক্ষে এ দেশের বুদ্ধিবৃত্তি, মিডিয়া, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ইত্যাদির অধিকাংশই রাজনৈতিক মতাদর্শ বা দলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ফলে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে যে ধরণের গণজাগরণ প্রয়োজন, তার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলের বিকল্প নেই। তাছাড়া, সমৃদ্ধি অর্জনের যে কৌশলের কথা বলা হয়েছে তাকে বাস্তবায়ন সরকারকেই করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোই আগামীতে সরকার চালাবে।

ভিশন ২০৩০ঃ

ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ বাংলাদেশের একটি চিত্র দেশবাসী, বিশেষ করে তরুণদের, সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ভিশন ২০৩০ নামে দেশকে নিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য অর্জনে প্রস্তাবিত কর্মসূচি জাতির সামনে পেশ করা যেতে পারে যার মূল শ্লোগান হতে পারে ‘বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের নিজের গাড়ী ও পাকা বাড়ী এবং প্রতিটি তরুণ-তরুণীর জন্য চাকুরী।’ নিজের গাড়ীর বিষয়টিকে সবথেকে বেশী হাইলাইট করতে হবে। এদেশের শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষের জন্য গাড়ী একটি অকল্পনীয় সৌভাগ্যের প্রতীক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানী যখন অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছিল, তখন ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই হিটলার ঘোষণা করেছিলেন, তিনি সকল জার্মান নাগরিক কিনতে পারেন এমন গাড়ী তৈরী করবেন। চার বছরের মাথায় ১৯৩৮ সালে সেই কার বাজারে আসে। তার দাম পড়ে ১০০০ মার্কের কম (মাত্র ৩২০ ডলার)। যাদের এ পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত নেই তারাও যেন কার কিনতে পারে তার জন্য কিস্তিতে কেনারও ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এই ঘটনা হিটলারের জনপ্রিয়তাকে আকাশচুম্বী করে তোলে। আজকেও যারা জাতিকে অকল্পনীয় সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে এগিয়ে আসবেন, বাংলাদেশের জনগণ তাদেরকে সমর্থন ও ভালোবাসা দিতে কার্পন্য করবে না।